বিজ্ঞান পত্রিকা পড়ুন ও পড়ান
১) এবং কি কে ও কেন, ২) মুখপত্র গণদর্পণ, ৩) জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ৪) উৎস মানুষ, ৫) প্রকৃতি ও মানুষ, কালান্তর (সোমবার), ৬) বিজ্ঞান ভাবনা, ৭) বিজ্ঞান বার্তা।

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, শ্রেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩। কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা-৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬

বর্ষ-১০ সংখ্যা - ৫ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/২০১৩ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২ টাকা

গ্রহরত্ন ধারণ অজ্ঞতার দাসত্বের নামান্তর

ক'দিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের একজন বরিষ্ঠ আইনজীবীর সাথে আলাপচারিতা হচ্ছিল। হঠাৎ করেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল তাঁর ডান হাতের আঙুলে। ভদ্রলোকের চারটে আঙুলে পাঁচটা আংটি। প্রত্যেকটির রঙ আলাদা। দেখে মনে হচ্ছিল, সত্যিই যেন ওর আঙুলে 'লাল-নীল-সবুজের মেলা বসেছে'। আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে নিজেই জানালেন, 'দেশের অন্যতম সেরা (!) জ্যোতিষীর দেওয়া ওই রত্নগুলো ধারণ করার পরেই আইনজীবী হিসেবে পসার বেড়েছে।' আমি বললাম, 'তাহলে সবই যদি হয় রত্নের কল্যাণে তবে আপনার মেধা ও পরিশ্রমের কোনও মূল্য নেই?' স্বভাবতই তর্কগড়াল বহুদূর। বললাম, 'ধরা যাক, গ্রহরত্নের জন্যই আপনার এত পসার, বাড়ি-গাড়ি-সম্পত্তি। আপনি যাঁদের যাঁদের হয়ে মামলা লড়ে জিতলেন, তাঁরাও তাহলে আপনার গ্রহরত্নের কল্যাণে উপকৃত হলেন, আবার যাঁরা হারলেন, তাও ওই একই গ্রহরত্নের সৌজন্যে। তাহলে একজন গ্রহরত্ন ধারণ করলে তাঁর তো উপকার হয়ই, অন্যেরও উপকার হয়, আবার কারও ক্ষতিও হয়, তাও আবার ওই রত্ন ধারণ না করেই। এটা কী করে সম্ভব?

এবার স্পষ্টতই বিব্রত দুঁদে আইনজীবী। যিনি আদালতে বিচারপতির সামনে যুক্তি-তর্কের জাল বিছোন, তিনি আমার ওই যুক্তিতে কুপোকাৎ। অগত্যা 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর' বলে বিতর্কে ছেদ টানতে বাধ্য হলেন আইনজীবী মশাই।

আইনজীবীমশাইকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, নেতা, মন্ত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মুটে, মজুর, শ্রমিক, ফেরিওয়ালা এমনকি ভিখিরিদের অধিকাংশের আঙুলেই শোভা (!) পায় নানা রঙা রত্ন। নান্দনিক বোধ থেকে রত্নের প্রতি আকর্ষণ থাকলে কিছু বলার নেই কিন্তু গ্রহের ফের এড়াতে বা 'দুষ্ট' গ্রহের প্রভাব কাটাতেই অধিকাংশ

এরপর 2 পাতায়

ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকারের হত্যার তদন্ত চাই

কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের আজীবন লড়াকু নেতা ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকার গত ২০ আগস্ট'১৩ সকালে নদীর ধারে প্রাতর্ভ্রমণ করার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

গত ১৪ বছর ধরে ডাঃ দাভোলকারের অন্দ্র শ্রদ্ধা নির্মূলান সমিতি (Andra Shradda, Nirmulan Samiti) মহারাষ্ট্রে কুসংস্কার, ঝাড়ফুঁক ও কালো যাদু বিরোধী আইন চালু করার দাবীতে প্রচার আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে

এরপর 3 পাতায়

সুস্থ থাকার পাসওয়ার্ড : অঙ্কুরিত বীজ এক ম্যাজিক ফুড

'ছিল রুমাল হয়ে গেল একটা বেড়াল'—ঠিক তাই। এ যেন সুকুমার রায়ের হ য ব র ল। ছিল এক জড় খাদ্য বস্তু হয়ে গেল প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর জীবন্ত এক খাদ্য ভান্ডার। এখানে অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, মুসুর, গম বা অন্যান্য বীজের কথা বলা হচ্ছে। প্রতিদিনের প্রাতরাশে বা অন্য কোন সময়ের খাবারের সঙ্গে বা খাবার হিসেবে যদি অঙ্কুরিত ছোলা বা অন্য কোন বীজ ২/৩ টেবিল চামচ খাদ্য তালিকায় রাখা যায় তাহলে শরীর তার প্রয়োজনীয় বেশ কিছু প্রোটিন, ফাইবার, যথেষ্ট পরিমান ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন ই, বি কমপ্লেক্স, ধাতব লবন ও বেশ কিছু অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট (প্রতিজারক) সহজেই পেয়ে যাবে। যা তুলনা মূলক ভাবে দেহকে কম খরচে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে।

শুকনো ছোলা, মুগ, বাদাম বা গমে ভিটামিন সি ও ই থাকে না বললেই চলে কিন্তু অঙ্কুরিত হওয়ার সময়, বীজে প্রাণের সঞ্চার হওয়া মাত্র ভিটামিন সি,ই ও এ (কেরোটিন) তৈরী হয়। এছাড়া বীজের যে অংশটিকে কল বলা হয়, সেই অংশে থাকে গ্লাইকোসিনোলেট নামের উদ্ভিজ রাসায়নিক যা একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। বিপাকজনিত কারণে বা প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে দেহে অক্সিজেন র‍্যাডিক্যাল তৈরী হয়। ফলে এর ক্ষতিকর প্রভাবে নানা রোগের সৃষ্টি হয়, শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। গ্লুকোসিনোলেট তার প্রতিজারণ ক্ষমতার প্রভাবে দেহকে নানা ভাবে সুস্থ রাখে, দেহে ক্যান্সারের আক্রমণও প্রতিহত করে।

অঙ্কুরোদগমের ফলে বীজ সহজ পাচ্য হয়। ডাল জাতীয় বীজে হজমে

এরপর 3 পাতায়

মহাকাশে মহিলা অভিযাত্রীর ৫০ বছর : ভেলেনতিনা তেরেসকোভা

ভেলেনতিনা ভ্লাদিমিরোভনা তেরেসকোভা বিশ্বের প্রথম মহিলা মহাকাশযাত্রী। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে সোভিয়েত রাশিয়ার এই মহিলা ভস্তক-৬ মহাকাশযানে সওয়ারী হয়ে মহাকাশে পাড়ি দেন ১৯৬৩ সালের ১৬ জুন। প্রায় তিন দিন মহাকাশে কাটিয়ে ফিরে আসেন পৃথিবীতে।

মধ্য রাশিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রাম

এরপর 8 পাতায়

গ্রহরত্ন ধারণ

1 পাতার পর

মানুষ রত্ন ধারণ করে। আর রত্নের এই রমরমা 'বাজার' তৈরির কারিগর যদি হয় জ্যোতিষি ও প্রচার মাধ্যম, তবে দায়ীও করতে হয় শিক্ষা ব্যবস্থার গলদকে। কারণ যে শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তি ও যুক্তিবোধকে সমৃদ্ধ করে না, 'সে-শিক্ষা অশিক্ষা'ই।

ছোটোবেলায় সবাই পড়েছি ৯-এ নবগ্রহ। যদিও বিগত দশকে বিজ্ঞানীরা প্লুটো-কে গ্রহের মর্যাদা না দেওয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে বর্তমানে সৌরজগতে গ্রহ সংখ্যা আট। অবশ্য জ্যোতিষিরা ওসব বিজ্ঞান-টিজ্ঞানের ধারে পাশে যান না। তাঁদের কাছে নবগ্রহের জন্য রয়েছে নবরত্ন (বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার নবরত্ন অনুকরণে)! অবশ্য জ্যোতিষিদের নবগ্রহ, আর বিজ্ঞান বইয়ের পাতায় পড়া নবগ্রহ হুবহু এক নয়। তাঁদের গ্রহ হল বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, রবি, সোম, রাহু ও কেতু। ঘাবড়ে গেলেন কি! রবি ও সোম নামে কোনও গ্রহের অস্তিত্ব বাস্তবে না থাকলেও জ্যোতিষশাস্ত্রে আছে! সাথে রাহু ও কেতু! (একা রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব দোসর!) রাহু আর কেতু বলে বাস্তবে কোনও গ্রহ বা উপগ্রহ কিংবা গ্রহানুও নেই। আসলে রাহু ও কেতু হল সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পরিক্রমন পথ এবং পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের পরিক্রমন পথের দুটি কল্পিত ছেদ বিন্দু। জ্যোতিষ শাস্ত্রে পৃথিবী, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো কিংবা নিকটবর্তী অন্যান্য নক্ষত্র ও ছায়াপথের প্রভাবের কথা অনুল্লেখিত থাকলে মহাশূন্যের ওই দুটি কাল্পনিক বিন্দুর নাকি ব্যাপক প্রভাব! ভাবা যায়! প্রসঙ্গত বলে রাখি, পাশ্চাত্য জ্যোতিষে আছে সপ্তগ্রহ, বাদ পড়েছে রবি, সোম, রাহু ও কেতু। পরিবর্তে রয়েছে চন্দ্র ও সূর্য। একবার ভাবুন, সূর্য নক্ষত্র নয়, চাঁদ উপগ্রহ নয়, উভয়েই গ্রহ!

তা গ্রহরত্ন ধারণের ব্যাপারে জ্যোতিষিদের নাকি কিছু নিয়ম(!) আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তথাকথিত এক একটি গ্রহের জন্য এক একটি রত্ন। যেমন, বুধ—পান্না (Enarald), শুক্র—হীরে (Diamond), মঙ্গল — প্রবাল (Coral), বৃহস্পতি — পোখরাজ (Topaz), শনি — নীলা (Blue sapphire), রবি—চুনী (Ruby), সোম—মুক্তো (Pearl), রাহু— গোমেদ (Jacinthzirion) এবং কেতু— বৈদুর্যমনি (Cat's eye)। জ্যোতিষিদের দাবি এবং মানুষের বিশ্বাস যে এই সব রত্নের উপর তথাকথিত গ্রহগুলির প্রভাব আছে এবং এই প্রভাব যিনি রত্ন ধারণ করেন তাঁর দেহে সঞ্চারিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে রত্নের বিকিরণ ধর্মের কথাও বলা হয়। ওই বিকিরণের দ্বারাই নাকি রত্নধারক প্রভাবিত হয়।

এবার চাহলে নবরত্নের আসল পরিচয়টা জানা যাক। মুক্তো ও প্রবাল হল জীব দেহজাত পদার্থ। মুক্তো তৈরি হয় বিশেষ কয়েকটি প্রজাতির ঝিনুকের (Pinctada Vulgaris, P. fucata) দেহে। এর মূল উপাদান কঙ্কিওলিন নামক প্রোটিন ও চুনাপাথর ($CaCo_3$)। প্রবাল হল সামুদ্রিক প্রাণী প্রবাল কীটের মৃতদেহ। এরও মূল উপাদান (৯৯ শতাংশ) হল চুনাপাথর ($CaCo_3$) । হিরে তো কার্বনের এক প্রকার রূপভেদ। চুনী ও নীলা হল অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড (Al_2Co_3)। বৈদুর্যমনি হল বরিলিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম বা সিলিকনের অক্সাইড। পান্নার উপাদানও বৈদুর্যমনির মতো। গোমেদ হল জিরকন ও সিলিকনের অক্সাইড। পোখরাজের মূল উপাদান অ্যালুমিনিয়াম, লোহা ও সিলিকনের অক্সাইড। এই সব উপাদানের সাথে মিশে থাকে নানা রকম ধাতব ও অধাতব অশুদ্ধি। অর্থাৎ মুক্তো ও প্রবাল ছাড়া বাকি সব রত্নই খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত।

এই সব রত্নের মধ্যে মুক্তো ও প্রবালের কাঠিন্য সামান্য কম হলেও বাকি রত্নগুলির কাঠিন্য এত বেশি যে ঘর্ষণে ক্ষয়ে গিয়ে শরীরে ঢোকার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। আর রশ্মি বিকিরণের যে তত্ত্ব হাজির করা হয় তা অবাস্তব কারণ এ যাবৎ ওই সব রত্ন থেকে কোনও বিকিরণের প্রমাণ আলোকবিজ্ঞানে নেই। তবে কিছু কিছু রত্ন খনিজে আলোকের অন্যান্য ধর্ম যেমন প্রতিফলন, প্রতিসরণ, দ্বৈত প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ ইত্যাদি দেখা যায়, যার ফলে রত্নের উজ্জ্বল্য, দ্যুতি ও রঙের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এ জন্য রত্ন অলঙ্কার হিসেবে আকর্ষণীয় হতেই পারে। তবে রত্নের স্বচ্ছতা, বর্ণময়তা, মসৃণতা, বর্ণময়তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে মূল উপাদানের সাথে মিশে থাকা অশুদ্ধির উপর। আমরা অনেকেই 'রক্তমুখী নীলা'-র কথা শুনেছি। এ নাকি খুব দামী ও দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু এই নীলা হল বেশি অশুদ্ধি মিশ্রিত নীলা, যার দরুন নীলা লাল বা বাদামি ছিটযুক্ত হয়।

অনেক সময় রত্ন শরীরে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তা হাতে কলমে চমকপ্রদভাবে উপস্থাপন করেন জ্যোতিষিরা। যেমন মুক্তো হঠাৎই ঔজ্জ্বল্য হারাল কিংবা প্রবাল তার বর্ণ ও মসৃণতা হারাল কিংবা পোখরাজ আঙুলে গলাতেই রঙ পাল্টে গেল। আঙুলে সামান্য তেল, ক্ষার বা অম্লের সংস্পর্শে প্রবালের বর্ণ ও মসৃণতা নষ্ট হয়। শরীরের সামান্য তাপে অশুদ্ধিযুক্ত পোখরাজ গোলাপি আভাযুক্ত হয়ে ওঠে। একই কারণে নিম্নমানের গোমেদ (জ্যাসিন্থ-জিরকন) আকর্ষণীয় নীল আভা যুক্ত বা বর্ণহীন হয়ে যেতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে এসব বিষয় অজানা নয়, জানেন জ্যোতিষিরাও। তাই তাঁরা 'অজ্ঞ' মানুষের সামনে 'তাক' লাগিয়ে দেন। আর 'নিজের চোখে দেখেছি' বলে সাধারণ মানুষ গ্রহরত্নের প্রতি আরও বিশ্বাসী ও নির্ভর হয়ে পড়েন।

এবার বলি, যে সব রত্নের কথা এতক্ষণ জানলেন সাধারণ মানুষের আঙুলে শোভিত রত্নগুলো কি প্রকৃতই সেই রত্ন? আমার উত্তর, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'না'। প্রকৃতজাত ওই সব রত্ন দুষ্পাপ্য এবং দামও খুব বেশি যা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে, ফলে রত্ন বলে যা গ্রহরত্নের দোকানে, এমনকি ফুটপাতেও বিকোয় তা নকল রত্ন। হীরে বলে যা বিক্রি হয় তা বেশিরভাগই কোয়ার্টজ। তাছাড়া কৃত্রিমভাবে হীরে, পান্না, চুনী, নীলা, গোমেদ সংশ্লেষ করাও যায়। এগুলো দেখতে প্রকৃতিজাত রত্নের মতো হলেও দাম কম। মাছের আঁশ থেকে নকল মুক্তো তৈরি করা হয়। দাম খুব কম। কিন্তু তাতে কী! জ্যোতিষী আর রত্ন ব্যবসায়ীদের ঘরে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান তো এইসব নকল রত্নের কল্যাণেই!

কয়েকটি সংবাদপত্র ছাড়া প্রায় সব সংবাদপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রতিদিন জ্যোতিষিদের সচিত্র বিজ্ঞাপন। রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রের বিজ্ঞাপনের পাতায় সংখ্যাটা আরও বেশি রয়েছে জ্যোতিষ পত্রিকা। বহু টিভি চ্যানেলে জ্যোতিষি ও গ্রহরত্নের বিজ্ঞাপন। জ্যোতিষ চ্যানেলও রয়েছে বহাল তবিয়তে। শহর মফস্‌সল জুড়ে জ্যোতিষিদের বিজ্ঞাপন। শহরের হোটেলগুলোতে জ্যোতিষির সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক 'চেম্বার'। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন প্রতারিত হচ্ছে ওই সব জ্যোতিষিদের হাতে। গ্রহরত্ন ধারণে যে রোগ সারে—এই প্রচার ভারতীয় আইন The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advt.) Act 1954, অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। অথচ সংবাদপত্র, টিভি

এরপর 3 পাতায়

অঙ্কুরিত বীজ

1 পাতার পর

বাধা দেওয়ার যে রাসায়নিক যৌগ থাকে অঙ্কুরিত হওয়ায় সময় তা অপসৃত হয়। গমে ফাইট্রেট নামের একটি প্রতি-পরিপোষক (Antinutrient) থাকে যেটি অনেকের হজমের ব্যঘাত ঘটায়। কিন্তু অঙ্কুরিত হওয়ার সময় এটি অদৃশ্য হয়। অঙ্কুরিত গম থেকে আটা তৈরী হলে এই সমস্যা থাকে না।

অঙ্কুরিত বীজ আমাদের খাদ্য তালিকাকে দুভাবে সমৃদ্ধ করে। প্রথমত সারা বছরই প্রয়োজনীয় ভিটামিন সরবরাহ করতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত এর মধ্যে যে প্রচুর পরিমানে উৎসেচক সৃষ্টি হয় তা দেহকে সুস্থ রাখে। তরতাজা রাখে। কাজেই অঙ্কুরিত বীজকে ম্যাজিক ফুড বলাই যায়।

প্রায় ৫০০০ বছর আগেই চীনা চিকিৎসকরা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ওষুধ হিসেবে ও পুষ্টিকর হিসেবে অঙ্কুরিত বীজ ব্যবহার করতেন। বাইবেলেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতেও প্রতিদিন প্রাতরাশের আগে শরীর সুস্থ রাখতে ছোলা, মুগ ইত্যাদি খাওয়ার চল ছিল। বিভিন্ন বীজ অঙ্কুরিত হতে ২-৭ দিন সময় লাগে। দ্বিতীয়/তৃতীয় দিনে ভিটামিন সি সবচেয়ে বেশী থাকে। তারপর আস্তে আস্তে কমতে থাকে। তবে অঙ্কুরিত টমেটো বীজ ও অঙ্কুর বেরোনো আলু খাওয়া উচিত নয়। কারণ এখানে বিষাক্ত হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড তৈরী হয়।

বীজ অঙ্কুরিত করার সহজ উপায় : অঙ্কুরিত করতে বীজ যেমন মুগ, মুসুর, ছোলা, বাদাম গম ইত্যাদি ডোবা জলে ৮/১০ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে জল ঝরিয়ে একটি সাদা পাতলা (মসলিন) কাপড়ে আলগা করে বীজগুলি বেঁধে, চারকোনা একটু পেঁচিয়ে একটি পাত্র ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে ১০-১৫ ঘন্টা। মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে কাপড়টিকে ভেজা রাখতে হবে। যখন কাপড়ের ফাঁক দিয়ে কলগুলি উঁকি মারবে তখন বীজগুলিকে রেফ্রিজারেটরে স্থানান্তরিত করলে ঠান্ডায় ও অঙ্কুরোদ্গম চালু থাকবে। ৫/৬ দিনের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলতে হবে, নাহলে ভিটামিন ও উৎসেচক দ্রুত কমতে থাকবে।

অঙ্কুরিত বীজের একটি মুখরোচক খাবার : এক বা একাধিক (৫০ গ্রাম) অঙ্কুরিত বীজ, একটি সিদ্ধ আলু, একটি ছোট পেঁয়াজ, একটি টমেটো ও অর্ধেকটা শশা। সব ধুয়ে পরিষ্কার করে, কুঁচিয়ে নিয়ে মেশাতে হবে। এবার চাট মশলা বা ধনে জিরে ভাজার গুঁড়ো, বীট নুন ও লেবুর রস পরিমান মত/স্বাদ মত মিশিয়ে হবে স্যালাড। নয়ত এর সঙ্গে দই মিশিয়ে নিলেও হয়ে যাবে জিভে জল আনা রায়তা স্যালাড বা রায়তা। এই ভাবেই পাওয়া যাবে ডবল ম্যাজিক ফুড পুষ্টিতে ভরপুর।

লেখক ঃ ড. ইরা ঘোষ, ১/৫ পূর্বাচল ক্যানাল, সাউথ রোড, পোঃ হাল্টু, কলকাতা-৭০০০৭৮, Phone : (033) 2484 2897, 9748101291

তথ্য সূত্র ঃ 1) Amulya Rao ; Sprouts : The wonder food, page 22-28, Nutrition : Vol 36 (2) 2007 2) Anil Kumar ; Specialty sprouts, page 16, Science Reporter : July 2003.

হত্যার তদন্ত চাই

1 পাতার পর

'সাধনা' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। মূলত: তার সমিতির আন্দোলনের জেরেই বড় অংশের বিরোধীতা সত্ত্বেও সম্প্রতি মহারাষ্ট্র সরকার বিধানসভায় কুসংস্কার ও কালো যাদু বিরোধী বিল পাশে রাজি হয়।

ডাঃ দাভোলকারের হত্যার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র জুড়ে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমেছে। প্রায় সর্বত্র বাজার দোকানপাঠ বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে হত্যার তদন্তে সহায়তা করতে মুম্বাই পুলিশের অপরাধ দমন শাখার অফিসাররা রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির রাজধানীতে (পুনে) পৌঁছেছেন। সর্বস্তরের মানুষ, নেতা, সমাজকর্মীরা শোক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

একই ভাবে আমরা বিজ্ঞান কর্মীরা ১৯৮০ সাল থেকেই কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ও ঝাড়ফুঁক-তুকতাকের বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন ও বিজ্ঞান পুস্তিকা প্রকাশ ও বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছি। The Drug & Magic Remedies (Objectionble Adverticment) Act, 1954 অনুযায়ী সব ধরণের অলৌকিক নিরাময়, অলৌকিক ও অবৈজ্ঞানিক প্রচার নিষিদ্ধ। এই আইনটি সর্বস্তরে প্রয়োগের দাবীতে আমরা গণ বিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার পক্ষ থেকে যৌথভাবে প্রচার আন্দোলন চালাচ্ছি।

আমাদের দাবী ঃ—

১) কুসংস্কার বিরোধী ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের পুরোধা ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকারের হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

২) কুসংস্কার, ঝাড়ফুঁক ও কালো যাদু বিরোধী আইন চালু করতে হবে।

প্রচারে ঃ—

বিজ্ঞান দরবার (রেজি নং এস/৩৯৪৪৪), কাঁচরাপাড়া।

বিজ্ঞান অন্বেষক, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, চাকদহ। তাং- ২৫/০৮/১৩,২০০০

গ্রহরত্ন ধারণ

2 পাতার পর

চ্যানেল, হোর্ডিং, লিফলেট সব মাধ্যমেই চলছে প্রচার, প্রশাসনের নাকের ডগায়। দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, বহু বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, দেশের সেরা সম্মান পাওয়া বহু বিশিষ্টজনের মধ্যেই যদি জ্যোতিষ ও গ্রহরত্ন সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও দূর্বলতা থাকে তবে আইনের বানী তো দু'মলাটের মধ্যে নিভৃতে কেঁদেই চলবে। রাতের আঁধার দূর করা সহজ, কিন্তু মনের আঁধার দূর করা অত্যন্ত কঠিন। কোনও আইন পারবে না এই আঁধার দূর করতে। পারবে একমাত্র যথার্থ শিক্ষা ও সচেতনতা। বিদেশিদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে লেগেছে দু'শো বছর। অজ্ঞতার এই দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে কত সময় লাগবে?

লেখক ঃ সৌম্যকান্তি জানা, পূর্ববাজার, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চলভাষ : ৯৪৩৪৫৭০১৩০, ই-মেইল : janasoumyakanti@gmail.com

শব্দ বাজি নয়, শান্তি চাই

সম্প্রতি জাতীয় পরিবেশ আদালত দিল্লীতে এক রায়ের মাধ্যমে রাজ্যে বাজির সর্বোচ্চ শব্দ সীমা ৯০ ডেসিবেল শিথিল করে ১২৫ ডেসিবেল করে দিয়েছেন। এর ফলে এবার পুজো বা উৎসবের সময়ে শব্দবাজির তান্ডবে মানুষ বিস্তর ভোগান্তিতে পড়বেন। ই.এন.টি.র বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন শব্দবাজি কানের পর্দার ক্ষতি করে, আচমকা 'শক' হার্টের রোগীরা মারা যেতে পারে। সুস্থ লোকেদের হৃদরোগ, মস্তিস্কবিকৃতি, নার্ভের রোগ বেড়ে যাবে। মাথা ধরা, মানসিক অবসাদ, নিদ্রাহীনতা ও উত্তেজনা ও মস্তিস্কের ওপর চাপ পড়বে। এছাড়া শিশুদের ও বৃদ্ধলোকদের ক্ষতির মাত্রা কয়েক গুন বেড়ে যাবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে নিরাপদ শব্দের প্রাবল্যমাত্রা ৬৫ ডেসিবেল। তাই আসুন শব্দবাজির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক রুখে দাড়াই। দাবীও উত্তুক শব্দবাদি নয়, শান্তি চাই। — বিজ্ঞান দরবার।

পরিবেশের বন্ধু বাদুড়

বাদুড় (Bat) প্রকৃতির অনন্য সৃষ্টি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী একটি প্রকৃত উড়ন্ত একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী।

এরাও প্রাণী রাজ্যে মানুষের মত, স্তন্যপায়ী শ্রেণীর 'কাইরোপ্টেরা' বর্গের অধীনে একটি প্রাণী। এই বর্গের অধীনে দুটো উপবর্গ আছে যথা— 'মেগাকাইরোপ্টেরা' ও মাইক্রোকাইরপোটেরা।

এই বর্গের অধীনে মোট ১৮টি গোত্র আছে যার ১টি মাত্র গোত্র এই 'মেগা কাইরোপটেরা' উপবর্গের অধীনে পড়ে। এই গোত্রের প্রতিটি প্রজাতির শেয়ালের মত মুখের গঠন কাঠামো - যাদের উড়ন্ত শেয়ালও বলে। বাকী ১৭টি গোত্র 'মাইক্রোকাইরোপ্টেরা' উপবর্গের অধীনে। যাই হোক সারা বিশ্বে 'কাইরোপ্টেরা' বর্গের অধীনে মোট ৯৭৭টি প্রজাতি এই মুহূর্তে বেঁচে রয়েছে।

আবার অন্যদিক দিয়ে এদের খাদ্য অভ্যাসের উপর নির্ভর করে এদেরকে দুটো গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায় যথা—ফলভোজী ও পতঙ্গভূক বা মাংসাশী। বস্তুত পক্ষে প্রথম প্রকারের প্রতিটি বাদুড়ের প্রজাতিই 'মেগাকাইরোপ্টেরা' উপবর্গের অধীনে। আর দ্বিতীয় প্রকারের বাদুড়ের প্রতিটি প্রজাতিই 'মাইক্রোকাইরোপ্টেরা' উপবর্গের অন্তর্গত।

ফলভোজী বাদুড় ঃ— ফলভোজী বাদুড় বহু উদ্ভিদের পরাগযোগ এবং বীজের বিস্তারে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে বিশেষ করে ক্রান্তীয় অঞ্চলে। অন্য দিকে পতঙ্গভূক বা কীটভোজী বাদুড় পতঙ্গপেস্টদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যদিও ফলভোজী বাদুড়রা সাময়িকভাবে ফসলের কিছুটা ক্ষতি করে কিন্তু অঙ্ক কষে প্রমাণ পাওয়া গেছে এরা দীর্ঘ মেয়াদী লাভ দিয়ে থাকে।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের বাদুড়েরা অরণ্যের ২৪ শতাংশ বীজের বিস্তারে সাহায্য করে। একটা হিসেবে দেখা গেছে যে 'নিউট্রপিক্যাল ধরণের বাদুড়দের ৯৬টি গনের' অধীনে প্রায় ৫০০টি প্রজাতির উদ্ভিদের সরাসরি পরাগযোগে এরা সাহায্য করে। অন্য দিকে এদের ১০০'র বেশী প্রজাতি বহু অর্থনৈতিক গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদের বীজের বিস্তার এবং পরাগযোগে সাহায্য করে— যেমন, 'Seba's short tailed' Fruit bat (Carollia perspicillata), ল্যাটিন আমেরিকার ক্রান্তীয় বর্ষাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাদুড়। এরা মূলত: 'পিপার গনের উদ্ভিদদের বিভিন্ন প্রজাতি (প্রায় ৩৫টি প্রজাতি) এবং 'সেক্রোপিয়া' গনের অধীনে প্রায় ৮-১০টি ফল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। একরাত্রে এরা ৬০,০০০ বীজ পর্যন্ত খেতে পারে। এই হিসেবে এদের ৪০০টি এরকম কলোনী বছরে ১৪৬ মিলিয়ন (১ মিলিয়ন =১০ লক্ষ) বীজের বিস্তারে সাহায্য করে। এর মধ্যে মাত্র ০.১ শতাংশ বীজেরও যদি অঙ্কুরোদ্গম ঘটে, তাহলে ১৪৬,০০০টি চারাগাছ জন্মাতে পারে।

বাদুড় ও ফুলের মধ্যে 'দেওয়া-নেওয়া ও পরস্পর উপকৃত হওয়ার' সম্পর্ক। একদিকে উদ্ভিদরা গন্ধ ও ফুলের বিভিন্ন অংশ গঠনে শক্তি খরচ করে, বাদুড়দের মত প্রাণীদের আমন্ত্রণ জানায়—মকরন্দ এবং রেণু খাওয়ার জন্য। অপরদিকে বাদুড়রা একফুল থেকে অন্য ফুলে রেণু ছড়াতে সাহায্য করে যার পরিণতিতে 'নিষেক' প্রক্রিয়া সম্ভব হয় - যেটা উদ্ভিদের বংশবিস্তার ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরী।

জীব বিজ্ঞানীদের মতে, কমপক্ষে ৪৪৩টি মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ১৬৩ রকম উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় যারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে বাদুড়দের দ্বারা পরাগযোগ কিংবা বীজের বিস্তারের উপর নির্ভরশীল। এই প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে কাঠ, ফল, তন্তু, ঔষুধ, খাদ্য ও অন্যান্য বহু স্থানীয় দ্রব্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের বনভূমি কমবেশী অনেকটাই এদের উপর নির্ভরশীল। এখানকার বেশ কিছু উদ্ভিদের ফুল প্রস্ফুটিত হয় রাত্রে যাদের স্বতন্ত্র গন্ধ, বর্ণ ও আকার বাদুড়দের আকৃষ্ট করে। এরকমই 'Baobab Tree' পূর্ব আফ্রিকার এমনই গাছ যাদের উপর অন্যান্য বহু বন্যপ্রাণী নির্ভরশীল। এই গাছগুলিকে অন্য কথায় 'Tree of Life' বলে।

এখানে বেশ কিছু সংখ্যক অর্থনৈতিক মূল্যযুক্ত বুনো শস্যের ফলন বাদুড়দের উপরই পুরোপুরি ভাবে নির্ভরশীল। এদের মধ্যে কলা, খেজুর, ডুমুর, পীচ্ ফল, আম, লবঙ্গ, কাজুবাদাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বর্তমানে এই উদ্ভিদদের চাষ করা হচ্ছে, তবুও এদের বুনো স্টক্ অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয়। ক্রান্তীয় বনভূমিতে একটি মুক্তস্থানে শতকরা ৯৫ ভাগ নতুন বনভূমি সৃষ্টির কারণই এদের দ্বারা বীজের বিস্তারের ফলশ্রুতি।

পতঙ্গভুক ও মাংসাশী ঃ—

স্বভাবে এদের সিংহভাগই কীটভোজী/পতঙ্গভূক বা মাংসাশী। এরা মূলত: নিশাচর কীটপতঙ্গ ধরে খায় যারা কিনা বহু ফসলের ক্ষতিকর পেস্ট বা কীট। এক একটা বাদুড় ঘন্টায় শ'খানেক কীটপতঙ্গ খেতে পারে এবং এভাবে এক-একটি বড় বাদুড় কলোনী কয়েক টন কীটপতঙ্গ এর রাত্রির মধ্যে শেষ করে দিতে পারে যাদের নিয়ন্ত্রণের পেছনে প্রশাসন এবং কৃষকদের বছরে কয়েক বিলিয়ন (১ বিলিয়ন =১০০ মিলিয়ন =১০ x১০ লক্ষ) টাকা খরচ করতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্ত Tadarida brasiliensis প্রজাতির বাদুড়ের এক একটি কলোনীতে ২০x১০=২০০ লক্ষ জীব থাকে যা এদের দেহের ওজনের শতকরা ৫০-৭০ ভাগ কীট খেয়ে ফেলে প্রতিরাত্রে এবং Myotis lucifugus বাদুড়টি দেহের ওজনের পুরো ১০০ শতাংশই খেয়ে ফেলে। টেক্সাসে একটি হিসেবে দেখা গেছে যে ১০ লক্ষ বাদুড়, ১০ টনের ওজনের পরিমান মত কীটপতঙ্গ সাফাই করে ফেলে মাত্র একরাত্রে। কানাডাতে এই ছোট বাদামী বাদুড় শতকরা ৮৫ ভাগ মশা সাফাই করে দিতে পারে মাত্র একরাত্রে। ফলে মশাবাহিত রোগের সম্ভাবনাই ৮৫ শতাংশ কমে আসে সে দেশে। বাদুড়রা এছাড়া লেপিডোপটেরা (প্রজাপতি, মথ্ প্রভৃতি), ডিপটেরা (মশা, মাছি প্রভৃতি), হোমোপ্টেরা (ঝিঁঝি পোকা, অ্যাফিড প্রভৃতি) এবং ট্রাইকপ্টেরা (ক্যাডি মাছি প্রভৃতি) বর্গের পতঙ্গদেরও এরা শিকার করে। এরা পতঙ্গপেস্টদের জৈব নিয়ন্ত্রক রূপে কাজ করে। বিভিন্ন শস্যের ক্ষতিকারক পোস্ট বা পতঙ্গদের নিয়ন্ত্রণ করে — আখেরে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও সুদৃঢ় করে।

এরা শসা পোকা, জুন পোকা, শস্য ছিদ্রকারী, জেরুজালেন ক্রিকেট প্রভৃতি ক্ষতিকারক পোকার হাত থেকে যথাক্রমে শস্য, তুলো এবং আলু প্রভৃতি রক্ষা করে। বোর্নিও দ্বীপের 'নিয়া গুহায়' প্রতিদিন ৭,৫০০ মিলোগ্রাম পতঙ্গপোকা খাওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়েছে এই বাদুড় সম্প্রতি।

এরপর 5 পাতায়

পরিবেশের বন্ধু বাদুড়

4 পাতার পর

বাদুড়ের বিষ্ঠা ঃ—

বাদুড়দের বিষ্ঠা বিভিন্ন কৃষিজ শস্যের গুরুত্বপূর্ণ জৈব সার রূপে কাজ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন গুহায় বহু বড় দল বা বাদুড় কলোনী (লক্ষ লক্ষ বাদুড়) এক সঙ্গে অনেক পরিমাণে বিষ্টার তৈরি করে। নিউ মেক্সিকোর 'কার লম্‌ব্যাড ক্যাভারান' এমনই একটি 'বাদুড়-বিষ্ঠা' দিয়ে তৈরি অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন বিষ্ঠা খনি। ১৯২৩ সালের একটি হিসেব অনুযায়ী সেই সময় ঐ খনি থেকে প্রতি বছর ১০১,৬০০ টন বিষ্ঠাকে 'জৈবসার' হিসেবে উত্তোলন করা হতো। তবে সম্প্রতি রাসায়নিক সারের বাড়বাড়ন্তের জন্য উন্নত দেশে এদের চাহিদা কমে আসছে। এই বিষ্ঠা ফসফেট ও নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ তাই খুব উন্নতমানের সার এটি। যাই হোক বহু উন্নয়নশীল দেশে আজও স্থানীয় অধিবাসীরা এর থেকে বহু অর্থ উপার্জন করে থাকেন। এই জৈব সার ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা অনেকটাই বেড়ে যায়।

বাদুড়ের অন্যান্য উপযোগিতা ঃ—

উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত এবং সমষ্টিগত ভূমিকা ছাড়াও 'বাদুড় গবেষণা'—বায়ুযান, বিমান চলাচলে, দিক নির্ণয় করতে, অন্ধ লোকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীতে, জন্ম নিয়ন্ত্রণে, কৃত্রিম গর্ভাধানে, টিকা উৎপাদন, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতিতে ব্যাপক আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভারতে প্রাপ্ত বিভিন্ন বাদুড় ঃ—

ভারত, বাদুড় বৈচিত্রেও অনন্য। ভারতে এই মুহূর্তে অন্তত পক্ষে ১৭টি প্রজাতির 'মেগাকাইরোপ্টেরা' এবং ৯৭টি প্রজাতির 'মাইক্রোকাইরোপ্টেরা' বাদুড় পাওয়া যায়। এই মোট ১১৪টি প্রজাতির বাদুড়ের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাদুড়-উড়ন্ত শেয়াল (Indian flying fox), কমলা-কালো বাদুড় এবং খুবই দুলর্ভ প্রজাতি 'সেলিম আলির ফল বাদুড় (Salim Ali's Fruit Bat) ভারতেই পাওয়া যায়। ভারতের সুউচ্চ হিমালয় থেকে দক্ষিণের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল; উত্তর পশ্চিমে থর মরুভূমি থেকে পূর্বের ক্রান্তীয় বিস্তীর্ণ অরণ্যাঞ্চল জুড়েই এদের দেখা মেলে। এখানে ফল, ফুলের মকরন্দ, কীটপতঙ্গ, ব্যাঙ এবং অন্যান্য ছোট বাদুড় খেকো সব ধরণেরই প্রজাতির বাদুড়ের দেখা মেলে।

এখানে, তিন মাস বর্ষা, তিন মাস শীত এবং বাকী সময় শুষ্ক ও গরম আবহাওয়ার জন্য আবহাওয়াও বৈচিত্রপূর্ণ। যে কারণে প্রচুর পরিমাণে ফল জাতীয় উদ্ভিদ এবং বহু কীটপতঙ্গের বাহার দেখা যায়।

উত্তর পূর্ব ভারতে প্রকৃতির আবহাওয়ার এই সব রঙই দেখা যায় বলে এখানে ৭০টির উপরও বাদুড়ের বিভিন্ন প্রজাতির দেখা পাওয়া যায়। এখানে প্রাপ্ত বাদুড়গুলো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত বাদুড়গুলোর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত। বিশেষ করে বার্মা, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়াতে প্রাপ্ত বাদুড় এর সাথে মিলযুক্ত। কিন্তু বাকী বাদুড়গুলো পশ্চিমি এশিয়ায় প্রাপ্ত বাদুড়গুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ভারতে প্রাপ্ত ১৭টি 'মেগাকাইরোপটেরা' উপবর্গের বাদুড়ের মধ্যে Indian flying fox, Fulvous Fruit Bat এবং Short Nosed Fruit Bat সারা ভারতেই দেখা গেলেও এই ৩টি প্রজাতি ছাড়া বাকি ১৪টি খুবই দুলর্ভ। দক্ষিণ ও উত্তর পূর্ব ভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া আর কোথাও এদের দেখা যায় না।

বাদুড় সংরক্ষণ ঃ—

সারা পৃথিবীতে বাদুড়দের সংরক্ষণের বিষয়ে এখনও তেমন ভাবে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়নি যার জন্য ক্রমশঃ এদের বহু প্রজাতি বিলুপ্তির প্রহর গুনছে। এদের বাসস্থান ও খাদ্যস্থান নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। এদের বিশ্রাম স্থান বিভিন্ন পরিত্যক্ত গুহা, পুরোনো বাড়ি, দালান প্রভৃতির সংস্কার করায় এবং মানুষের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার ফলে এরা এরকম বাস্তুচ্যুত। ডুমুর-গাছ সাধারণ ভাবে পছন্দ করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক কারণে এদেরকে সেখানে বসতে দেওয়া হয় না। মন্দিরের ফাটলে, চূড়াতে একই কারণে এদের থাকতে দেওয়া হয় না। কৃষি কাজে অত্যধিক হারে পেস্টিসাইড, ইনসেক্টি সাইড প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে পতঙ্গভুক্ত বা মাংসাশী বাদুড়দের জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে ধীরে ধীরে এদের প্রজনন ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে—এদের সংখ্যা কমে আসছে। বাদুড়কে নিয়ে বিভিন্ন লোক গাথা প্রচলিত আছে। সব ক্ষেত্রেই এদেরকে অন্তত শক্তি পরিচায়ক-ভিলেন বানানো হয়। সিনেমার পর্দায় এদেরকে 'ড্রাকুলা' বা 'ভ্যামপায়ার' বা 'রক্তচোষা' দানব বানানো হয়। যেকারণে গ্রামাঞ্চলে শহরে এদের প্রাপ্য ভালবাসা, পৃথিবীতে বাসের অধিকারটুকু ধীরে ধীরে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ফসলের ক্ষতির অজুহাতেও এদেরকে স্বাভাবিক ভাবে থাকতে দেওয়া হয় না। লোক সমাজে প্রচলিত আছে যে, যার বাড়িতে/অঞ্চলে বা গাছে এরা অবস্থান করে, তাঁর ক্ষতিই নাকি হয়।

ভারতে প্রাপ্ত ১১৪টি প্রজাতির বাদুড়ের মধ্যে মাত্র দুটি প্রজাতি যথা—Wroughton's Free Tailed Bat এবং Salim Ali's Fruit Bat কেই ভারতের বন্যপ্রাণী আইন, ১৯৭২ এর তপশীল-১ অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে আইনী সর্বোচ্চ সুরক্ষা কেবলমাত্র এদেরকেই দেওয়া হয়েছে। ফলভোজী বাকি ১৬টি প্রজাতিকে একই আইনের তপশীল-৫-এ হিসেবে রাখা হয়েছে যেখানে বলা আছে প্রয়োজনবোধে শিকারও করা যেতে পারে, আইনগত কোন বাধা নেই। আর বাকি বাদুড়দের জন্য এখনও পর্যন্ত আইনগত তেমন কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই।

বাদুড়! পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্গত 'কাইরোপ্টেরা' বর্গের অধীনে (রোডেন্ট ইদুরদের বর্গের পর)। এরা উত্তর গোলার্ধের 'আর্কটিক' অঞ্চল এবং দক্ষিণ গোলার্ধের 'অ্যান্টার্কটিকা' অঞ্চল ছাড়া আর পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন একরাত্রে এক একটি বাদুড় প্রায় ৪০০০ পতঙ্গ ধরে খেতে পারে। মেক্সিকোর সারা গ্রীষ্মকালে ৬০০০ টন পতঙ্গ ধরে খেতে পারে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বাদুড় ঘোড়া, ছাগল, শুয়োর, গরু প্রভৃতি প্রাণীদের দেহ থেকে রক্ত শুষে খায় যার পরিমান আনুমানিক ১০-১৫ মি.লি. প্রতি রাত্রে। Desmodus Rotundus নামক বাদুড় মানব দেহে চামড়ায় দাঁত বসাতে পারে তবে মানব রক্ত খায় না। কাজেই বাদুড় মানুষের ক্ষেত্রে এখনই বিপদজ্জনক নয়। অনেক বেশি কাজের নিকটবর্তী। আমেরিকান বিজ্ঞানী ডোনাল্ড গ্রিফিন ১৯২০ সালে এদের জীবনে 'ইকোলোকেশন' (Echolocation) ঘটনাটি আবিষ্কার করেন যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত লোকগাথা, ভুল ধ্যান ধারণা প্রচলিত আছে সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই, তাই সেগুলো মুছে ফেলে দিয়ে আমাদের নিজেদের তাগিদেই এদের বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, অন্যান্য বহু মূল্যবান প্রাণীর মত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী এরা। বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত প্রাণী রাজ্যে এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে আসবে।

লেখক ঃ — রাজা রাউত, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব
মোঃ-৯৪৭৪৪১৭১৭৮

উটের দুধ ঃ ভবিষ্যতের খাদ্য

উটের দুধ, নামটি সম্বন্ধে আমরা কিছুটা অপরিচিত হলেও এটি কিন্তু খুব একটি পরিচিত খাদ্য উপাদান শুষ্ক অঞ্চলের মানুষদের কাছে। পুষ্টিমূল্যের বিচারে এটি অন্যান্য দুধের থেকে কিছু অংশে কম নয়। এতে খুব কম পরিমানে কোলেস্টেরল, প্রোটিন, শর্করা উপস্থিত। যার ফলে যে ব্যক্তি দুগ্ধ শর্করা (ল্যাকটোজ) সহ্য করতে পারেন না, তার ক্ষেত্রে এই দুধ খুবই উপযোগী। এই উটের দুধে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, দস্তা, ম্যাগনেশিয়াম, লোহা প্রভৃতি ধাতু উচ্চমাত্রায় উপস্থিত এবং নানা ভিটামিনও উপস্থিত এতে। উচ্চ পরিমাণে উদ্বায়ী ফ্যাটি অ্যাসিড (volatile fatty acids) যেমন লিনোলেইক অ্যাসিড এতে উপস্থিত এবং এছাড়াও রয়েছে পলি অ্যানস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড (PUFA)। এই দুধ Antimicrobial জীবানু প্রতিরোধক, Antidiarrheal (পেট খারাপ জনিত রোগ প্রতিরোধ), Antioxidative (বিজারিত যৌগ), Antithrombotic (রক্তজমাট প্রতিরোধী), Antihypertensive (রক্তচাপ আধিক্য প্রতিরোধী) হিসাবে কাজ করে এবং এই দুধের আছে immunomodulatory কার্যকারিতা। ইহা Antiulcenogenic এবং গ্যাস্ট্রিক আলসার যা প্রধানত হয় ইথানল থেকে তার বিরুদ্ধে খুবই কার্যকরী। এছাড়াও এর আরও নানা গুণ আছে। যেমন— জন্ডিস (Jaundice), প্লীহার সমস্যা (Splenic problem), হাঁপানি (Asthma), রক্তাল্পতা Anemia), ডায়াবেটিস (Diabetes) প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের জন্য উটের দুধ গ্রহণ করা যেতেই পারে।

পরীক্ষার দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, উটের দুধ খুবই উপকারী যকৃতের সমস্যায় যে সমস্যাটা প্রধানত হয় অ্যালকোহল থেকে (Alconol - induced live injury) কাঁচা উটের দুধ Type 1 diabetes এর ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। এই দুধে ইনসুলিনের পরিমান প্রায় 52 units insulin/litre.। উটের দুধ পাকস্থলীতে Coagulum (তঞ্চন) তৈরী করে না এবং ইনসুলিন বা ইনসুলিন এর মতো প্রোটিনকে ধরে রাখে এবং এই প্রোটিনটি অন্ত্র থেকে শোষিত হয় এবং Type 1 diabetes রোগীর ক্ষেত্রে Glycemic Levelটি বজায় রাখে। উটের দুধের এই গুণের জন্য উত্তর-পশ্চিম ভারতের 'রেইকা' (Raica) সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো ডায়াবেটিসের লক্ষণ দেখা যায় না, কারণ তারা উটের দুধ খায়। উটের দুধের এই বহুল গুণাগুণের জন্য এর চাহিদা ক্রমশ বর্ধনশীল। *—শমীক দে, Source : Science Reporter, Aug. '13*

খবর

১) ২৬ জুলাই ফামার (একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ) উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে 'বিপন্ন স্বদেশ ঃ বীজ, খাদ্য ও জিনের অধিকার' এক আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন বিশ্বখ্যাত পরিবেশবিদ ড. বন্দনা শিবা ও হিন্দু পত্রিকার সাংবাদিক পি. সাইনাথ। সভায় বিজ্ঞানকর্মী সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশ গ্রহণ করেন।

২) ৬ আগস্ট হিরোশিমা দিবসে পরমাণু চুল্লী নয়, চাই বিকল্প শক্তি, চাই দূষণ মুক্ত পৃথিবী—আহ্বানে বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া স্টেশনে এক প্রচার সভার আয়োজন করে। সভায় লিফলেট, পোস্টার পত্রপত্রিকাসহ প্রচার করা হয়।

৩) ৯ আগস্ট নাগাশাকি দিবসে বিজ্ঞান দরবার ও চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে মদনপুর স্টেশনে বিকল্প শক্তির পক্ষে এক প্রচার সভার আয়োজন করা হয়।

'চাষে লাভ নেই'

একটি বিশেষ প্রতিবেদন

সত্যি কি তাই? 'চাষে লাভ নেই?' ভাবতে কষ্ট হচ্ছে এই কারণে যে, আমরা যে দেশের নাগরিক সে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ কৃষি কাজে নির্ভরশীল। ভারতের অর্থনীতির মেরুদন্ডই হল কৃষি ব্যবস্থা। সেই যে আদিমকালে মানুষ কৃষিকাজ শিখেছে এখনও তা সমানভাবে সে চালিয়ে যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় সবাইকে। কৃষিকেও চলতে হয়েছে। বহু উন্নত প্রযুক্তি কৃষিতে প্রযুক্ত হয়েছে এই বিপুল সংখ্যার মানুষের মুখে অন্ন সংস্থানের জন্য। কিন্তু এই কৃষিকাজে যারা সরাসরি যুক্ত, অর্থাৎ কৃষক তাদের অবস্থার উন্নতি হয়নি এতটুকু। তারা সেই তিমিরেই থেকে গেছে। নানা সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত এবং দিনের পর দিন লাঞ্ছিত হতে হতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এসে তারা চাষের প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। চাষ করে লাভ নেই এই ধারণা তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। এই বিষয়কেই কেন্দ্র করে সম্প্রতি ১৪ জুলাই, ২০১৩ চাকদহের ঘুগিয়া ভুবনীমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী শ্রী অনুপম পাল মহাশয়, যিনি বর্তমানে ফুলিয়ায় 'এগ্রিকালচার ট্রেনিং সেন্টারে' গবেষণায় নিযুক্ত। উপস্থিত ছিলেন এলাকার চাষী ভাইয়েরা এবং আরও অনেক বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রীরা। চাষীরা তাদের চাষবাস সংক্রান্ত নানা সমস্যার কথা বলছিলেন এবং তিনি তাদের সমস্যার সমাধান বলে দিচ্ছিলেন। তিনি জোর দিয়েছিলেন প্রথাগত পদ্ধতির ওপর। তিনি এও উল্লেখ করেছিলেন যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রায় ৮২ হাজার ধানের প্রজাতি ছিল, বর্তমানে প্রায় সবগুলোই তা লুপ্ত। তিনি আরও নানা তথ্য তুলে ধরে চাষীদের চাষের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে অগ্রসর হন। আশা করি তার প্রচেষ্টা সফল হবে। এটা ধ্রুব সত্য যে বিজ্ঞানের নতুন প্রযুক্তিকে কালের নিয়মে আমাদের মেনে নিতেই হবে, তবে প্রথাগত ব্যবস্থাকে কখনোই বাদ দিয়ে নয়। আর ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে আমাদের দ্বিতীয়বারের জন্য যেনও 'চাষে লাভ নেই' এরকম হতাশাব্যঞ্জক মন্তব্য না শুনতে হয়, আমরা সেই চেষ্টাই করব।..

প্রতিবেদক ঃ শমীক দে

চিঠি ছোটই সুন্দর

তোমাদের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা পেলাম। অরণ্য সম্পদ নিয়ে লেখাটা খুবই ভাল এবং তথ্যপূর্ণ। 'সমাধান কোন পথে' অংশটি সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে।

আমি তোমাদের প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে (Young activistsস Class-IX-XII, College & Unversity Students) নিয়ে ১ দিনের একটা ক্যাম্প কর। বিষয় ঃ 'পরিবেশ ও সমাজ'। যারা বিজ্ঞান ও পরিবেশ আন্দোলন করে তাদের মধ্যে অনেকেরই এই যে সার্বিক পতন (Collapse) তার মূল কারণ সে সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত নয়। আয়োজন করো, আমি আরও একজন পরিবেশবিদকে যার সামাজিক বোধ আছে নিয়ে যাব।

দ্বিতীয় প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে তোমাদের ওদিককার বিভিন্ন Science Teachers & Science activistsস সায়েন্সদের নিয়ে (Workshop বিষয় ঃ Where there is no laboratory how science can be learnt by doing with low cost no cost materials.

শুভেচ্ছা নিয়ো। —সমর বাগচি, মোঃ-৯৪৩৩৫২৬৮৩৯

সাবধান সুখ টান

অকুতোভয় জাপানীরা হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পড়া অ্যাটম বোমার ধ্বংসলীলা দেখে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কালবিলম্ব না করে আত্মসমর্পন করেছিল মিত্র শক্তির কাছে। ধূমপান থেকে কত কী ধ্বংস হচ্ছে চোখের আড়ালে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেন ধূমপান তথা সুখটান থেকে বিরত থাকা দরকার, তার জন্য এ রচনা।

ধূমপান বলতে আমি তামাক (গড়গড়া, হুঁকা), চুরুট, সিগারেট, বিড়ি প্রভৃতির ধোঁয় সেবনকেই বুঝি। একটি সিগারেট খেলে ২৫ মিলি গ্রাম ভিটামিন 'সি' নষ্ট করে দেয়। তিরিশটি থেকে ৭৫০ মিলিগ্রাম নষ্ট হয়। মানব শরীরে ১০০০ মিলি গ্রাম ভিটামিন 'সি'র ভাঁড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বা অনাক্রম্যতা ব্যবস্থার সেরা অস্ত্র (এবং সেজন্যই প্রকৃতি-মা টক জাতীয় ফলের প্রাচুর্যে ভরিয়ে রেখেছে), সেজন্য ধূমপানের ফলে ক্যানসার সহ রোগগুলিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বা ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। আরো সব বিপত্তি আছে, তাদের কয়েকটি দেওয়া হলঃ ১) ধূমপান থেকে ক্যাডমিয়াম ঢোকে শরীরে, কিডনীতে পাথর হয় (কিডনীর পাথরের জন্য অন্য আরো কারণ আছে। ২) ধূমপান থেকে উচ্চ রক্তচাপের কারণ ঘটে; ধমনী সরু করে দেয়, দেহে মেদ বৃদ্ধি ঘটায়, ৩) সিগারেট হাড় শোষণ করে থাকে, আসলে সিগারেটের তামাকের নিকোটিন ক্ষুদ্রান্ত্রে (স্মল ইনটেশটাইনে) ক্যালসিয়াম গ্রহণে বিপত্তি ঘটায়, (৪) ধূমপান ফ্রিয়াডিক্যাল বাড়িয়ে দেয় চোখে-অকালে ছানি চলে আসে। ৫) ধূমপান থেকে তামাকের কেমিক্যাল অন্ননালী (ইশোফেগাশ) কে উত্তেজিত করে এবং পাকাশয়ের মধ্যের ভালভের দূর্বলতা বাড়িয়ে দেয়; ফলে অম্লক্ষরণের পরিমান কমে গিয়ে খাদ্য জমে বিঘ্ন ঘটে। ৬) ধূমপান প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস করে, গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকে; মহিলাদের ঋতুবন্ধ (মেনোপজ) হওয়ার সময় এগিয়ে আসে দুবছরেরও বেশি। ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে ধমনীর রোগ বা হৃদরোগ বাড়াতে ঝুঁকি তৈরি করে। ত্বকের জরা ত্বরান্বিত করে। ৭) হাড়ের ভিতরের খনিজের মাত্রা কমিয়ে অস্টিওপোরোসিসের আগমন ডেকে আনে। ৮) ধূমপান থেকে তামাকের কেমিক্যাল অমরাতে (প্ল্যাসেন্টাতে) রক্তসরবরাহ কমিয়ে দেয় এবং অক্সিজেন ও পুষ্টিকর পদার্থ গর্ভের শিশুর কাছে পৌঁছতে বাধা হয়। শিশুর জন্মের সময় এগিয়ে আনে এবং বা নবজাতক শিশুর হঠাৎ মৃত্যু হয়ে যায় (এই পরিণতিকে কটডেথ বলে)। যে সিগারেটে টার' কম থাকে, তা থেকে কার্বন মনোক্সাইড বেশি বাড়িয়ে দেয় - পরোক্ষতঃ শিশুর (গর্ভস্থ) অক্সিজেন সরবরাহ কমিয়ে দেয়। ৯) ক্ষতের নিরাময় হতে দেরি হয়; অ্যাজমা (হাঁপানি), ব্রংকাইটিস, এমফাইসিমা ইত্যাদি শ্বাস কষ্টের রোগ ডেকে আনে; উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বাড়ায়, বধিরতা বাড়ায়; কোলাইটিসে ক্ষত বাড়ায়। ১০) রেনোডস সিনড্রোম' সিনড্রোম' ঘটে যখন হাত পায়ের আঙুলের আশেপাশের রক্তজালিকার চারিদিকের পেশিতে সংকোচন ঘটায়; ফলে ঐসব অঞ্চলে রক্ত চলাচল কমে যায়। ধূমপান এই 'রেনোডস্ সিনড্রোম' রোগের ক্ষেত্রে ধমনীর কাজের সংকোচন ঘটায়।

ধূমপান থেকে ভিটামিন 'সি' ছাড়াও মূল্যবান ভিটামিন 'ই' নষ্ট করে দেয়। এরা দুটিই অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যাটিঅক্সিড্যান্ট। সেজন্য এদের অভাবে অনাক্রম্যতা বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দূর্বল হয়। সেজন্যই ঠান্ডার রোগ, শ্বাসকষ্টের রোগ, হে ফিভার ক্যানসার সহ রোগগুলির প্রভাব বেড়েই চলেছে। এই অসহায়তার একমাত্র প্রতিকার ধূমপান বন্ধ করা, সুখটান থেকে বিরত থাকা। 'ডোপামাইন-এফেক্ট' থেকে মস্তিষ্কে একরকম আরাম-অনুভূতি তৈরি করে। এখন এই সুখটান পরম প্রাপ্তি কিনা ভেবে দেখার সময়।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৩১.০৫.২০০৫ তারিখে বলেছিলেন 'কোন দুঃখে সিগারেট ছাড়তে যাবো ? কমানোরও প্রশ্ন নেই'। এখন আর তিনি প্রকাশ্যে সিগারেট খান না, নজরে পড়েনি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের সৌজন্যে রসিক পাঠকের কাছে আবেদন—সাঁইত্রিশ বছরের ধূমপান অভ্যাস ত্যাগ করে আজ তেরো বছর লেখক অনেক অনেক স্বস্তিতে আছে।

অন্যদিকে পরিবেশবিদরা বলবেন, সিগারেটের আগুন অক্সিজেন বিনাশ করে। অতএব সিদ্ধান্ত পাঠকের।

—রনজিৎ পাল, ফোনঃ ২৪৭১৫৯০৩ / মোঃ ৯৮৩১২০৬৫৪৬

মহাকাশে মহিলা

1 পাতার পর

মস্ত্রলেনিলোভা। এই গ্রামে ভেলেনতিনার জন্ম ১৯৩৭ সালের ৬ মার্চ। বাবা ভ্লাদিমির তেরেসকোভা একদা ট্রাক্টর চালক এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামী। মা ছিলেন কাপড়ের কলের কর্মী। বছর আটেক গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষালাভ করে ছেড়ে দেন। পরে দূর শিক্ষায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। কারণ প্যারাসুটে চেপে শূন্যে ওড়ার নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। প্যারাসুট এবং স্কাইডাইভিং এর অ্যাডভেঞ্চারে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মাতোয়ারা। স্কাইডাইভিং এর এই নেশাই তাঁকে পরবর্তী সময়ে মহাকাশচারী হিসাবে নির্বাচিত হতে সাহায্য করেছিল।

১৯৬১ সালে ইউরি গাগারিন এর সফল মহাকাশ যাত্রার পর সোভিয়েত রকেট ইঞ্জিনিয়ার সার গে কোরোলিয়ভ মহাকাশে মহিলা যাত্রী পাঠাবার পরিকল্পনা করেন। শুরু হল প্রার্থী বাছাই পর্ব। চার শতাধিক আবেদনকারীর মধ্য থেকে বাছাই করা হল ৫জনকে। এঁদের মধ্যে তেরেসকোভা ১জন।

মহাকাশ যাত্রার আগে বাছাই করা প্রার্থীদের প্রত্যেককে নিতে হয়েছে বিস্তর প্রশিক্ষণ। ভারহীন অবস্থায় ওড়ন, সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট, রকেট সম্পর্কিত খুঁটিনাটি জ্ঞান, প্যারাসুট জাম্প এবং জেট ফাইটার প্লেনের চালনা ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড় অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাঁদের গড়ে তোলা হয়েছে। কয়েক মাস প্রশিক্ষণের পর পরীক্ষাও দিতে হয়েছে। পরীক্ষায় এই ৫জনের মধ্যে টিকে রইলেন ৪জন। ঠিক ছিল তেরেসকোভাকে ভস্তক-৫ মহাকাশযানে ১ম পাঠানো হবে এবং পরে সাথী মহাকাশ যাত্রী পোনো মারোইওভা যাবেন ভস্তক-৬ এ। সেই পরিকল্পনা বাতিল করে ভস্তক-৫ এ সওয়ারী হন এক পুরুষ মহাকাশ যাত্রী নাম ভেলারি বাইকোভস্কি। ভস্তক-৬-এ যাত্রী হন তেরেসকোভা। ১৯৬৩ সালের ১৪ জুন যথা সময়ে ভস্তক-৫ আকাশে উঠল। ১৬ জুন সকালে এল সেই ক্ষণ। ২ ঘন্টার শেষে ভস্তক-৬ উঠে গেল আকাশে। পৃথিবীর ১ম মহিলা মহাকাশযাত্রী ভেলেনতিনা তেরেসকোভা পাড়ি দিলেন মহাকাশে।

প্রায় ৩ দিন মহাকাশে থেকে ৪৮ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করলেন তেরেসকোভা। একক যাত্রায় তিনি যে সময়কাল মহাকাশে কাটান তা আগের অনেকের খেপে খেপে যাত্রার মোট উড়াল কালের থেকেও বেশি।

— লেখকঃ রতন দেবনাথ, ফোনঃ (০৩৩) ২৫৮২ ৩৬৭০

বকফুল

(Sesbania grandiflora)

ছোট্ট বেলায় একটা মজার খেলা আমরা খেলতাম, ফুল চেনাচেনি। কে কটা ফুল চেনে, এটাই ছিল খেলা। একবার ভাঁট ফুল চিনতে না পেরে দাদুর কাছে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি ফুল বলতো? দাদু গম্ভীর হয়ে বললেন 'বিউটি ফুল' তাই যে কোনো অপরিচিত ফুলকে মজা করে এখন বিউটি ফুল বলি।

আজ যে ফুলের কথা বলব তা দেখতে শুধু বিউটি ফুল নয় খেতেও।

কুঁড়ি থেকে ফুটে উঠতে উঠতে ক্রমশ ফুলটি পাখির ঠোঁটের আকার নেয় আর ধবধবে সাদা ফুলটি তখন যেন খানিকটা বকপাখির মুখের আভাস। কোনো এক অখ্যাত মানুষ হয়ত এরনাম দিয়েছিলেন বকফুল তাই বাংলার গ্রামে গ্রামে এই নামেই ডাকা হয় এই ফুলকে।

আড়াইশো বছর আগে কবি ভারতচন্দ্র রায় বাংলার নানান ফুলের আসরে এক গৌরব আসন দিয়েছিলেন অশোক কিংশুক/মধুটগার/চম্পক পুন্নাগ নাগকেশর/গন্ধরাজ/মনোহর/বসাক বক সেফালিকা।

হেমন্তের হাওয়ায় হাওয়ায় শীত শুরুর আমেজ যখন গুছিয়ে বসার আয়োজন করছে সাধারণ সেই সময়ই বকফুল গাছে থোকায় থোকায় ফুটে ওঠে ফুল। ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সে দৃশ্য বড় মনোহর আমাদের পাড়ায় যে চারটে বকফুল গাছ ছিল তার সব কটিতেই সাদা বকফুল হত। কিন্তু বাংলায় লাল এবং হালকা গোলাপি রঙের আরো দু ধরণের বকফুল দেখা যায়। সবুজ বৃতির ওপর বাঁকানো ফুলগুলো ফুটে উঠতে দুই থেকে তিন দিন সময় নেয়। পুরো ফুটে গেলে পাপড়ি দুই গুচ্ছে বিভক্ত হয়ে যায় এবং গর্ভদন্ড সহ দশটি পুংকেশর উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

ফুলটি পুরোপুরি ফোটার আগে বেসন দিয়ে ফুলটির বড়া ভাজা দারুন। গাছটি খুব একটা বড় হয় না। কান্ড বাদামি ও মসৃন। অনেকটা সজনে গাছের মতো এই গাছের ডাল এতো নরম, একবার বকফুল পাড়তে গিয়ে আমার বন্ধু ডাল ভেঙে পড়ে হাত ভেঙে যায়। আর পাতাগুলো সজনে পাতার মত যৌগিক। একটা সরু শিরার দুপাশে গাঢ় সবুজ আয়তকার অনেক পাতা পরপর সাজানো থাকে। গাছ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে ফুল ও ফলের যোগ্য হয়ে ওঠে। বর্তমানে বকফুলের চাষ হচ্ছে পুরুলিয়া, বাকুঁড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণায়। আমি দেখেছি হেমন্তের শুরু থেকে চৈত্র বৈশাখ পর্যন্ত খুব বেশি ফুল হয়। কিন্তু সারা বছর অল্প অল্প ফুল হয় এই বকফুল গাছগুলোতে।

এই গাছের আয়ু আট থেকে দশ বছর। এর বৈজ্ঞানিক নাম সেসবানিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এই গাছের আদি বাসস্থান।

এই ফুলে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, খনিজ পদার্থ, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন, আয়োডিন ইত্যাদি খাদ্যগুন আছে। ফুলের চেয়েও শুঁটিতে রয়েছে আরও বেশি খাদ্যগুণ। বাকুঁড়া, পুরুলিয়ার রাস্তার ধারের বহু হোটেলে বকফুল ভাজা অথবা বকফুল বড়া একটা দারুণ মেনু।

প্রকৃতি থেকে এই গাছ কমে যাচ্ছে। এই গাছকে বাঁচাতে বাড়িতে বাড়িতে বকফুল গাছ লাগান।

—বিবর্তন ভট্টাচার্য, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা।

মোঃ-৯৩৩২২৮৩৩৫৬

সারস

সারস জলচর প্রাণী। তাই, জলের কাছাকাছি গাছে এরা ঘাস, খড় প্রভৃতি দিয়ে বিরাট বাসা বানায়। বিশ্বের প্রায় সর্বত্র সারস দেখা যায়। আমাদের দেশে অন্য দেশ থেকে দু রকমের সারস শীতকালে বেড়াতে আসে।

এদের আকৃতি সাধারণ পাখিদের চেয়ে বড়। এদের গায়ের রং ধূসর। পাগুলি লম্বা লম্বা এবং যে পায়ে কোনো লোম থাকে না। এছাড়া পা দুটি সরু, পায়ের বর্ণ বা রং লাল। এদের মাথাটা ন্যাড়া এবং গলার উপরের ভাগ লাল।

এরা সাধারণত ঝাঁক বেঁধে না ঘুরে, জোড়ায় জোড়ায়, জলাভূমি বা চাষের জমিতে ঘুরে বেড়ায়। কোনও কোনও জলাভূমির কাছে কখনও কখনও একশত জোড়া সারস দেখা যায়। এদের জুটি সহজে ভাঙে না। এরা খুব শান্ত ও নিরীহ পাখি। বিরক্ত না করলে, ওরা এক জায়গাতেই ঘোরে। গ্রাম্য মানুষেরা কখনও সারস মারে না। তবে পরের শহরের শিকারীরা গ্রামের কাছের জলাভূমিতে গিয়ে, সুস্বাদু মাংসের লোভে অনেক সময় তাদের মেরে মাংস খায়। এরা সেই জন্য সব সময় সদা সতর্ক থাকে। এরা বড় একটা পোষ মানে না। বৃহদাকার হলেও ওরা উড়তে পারে এবং বেশ দ্রুতই ওড়ে। এরা ওড়বার সময়, ওদের পা দুটি পেছনে করে ডানার সঙ্গে তা দ্রুত নাড়তে থাকে। এরা জোরে ডাকে— বেশ ভরাট গম্ভীর গলায়। প্রজনন ঋতুতে, পুরুষ ও স্ত্রী পাখি উভয়েই ডানা মেলে, মাথা নত করে, পরস্পর পরস্পরের দিকে ছুটে আসে। আবার কখনও কখনও এরা মাটিতে দাঁড়িয়ে লাফালাফি করে। এদের খাদ্য— ছোটো ছোটো দাঁড়িয়ে লাফালাফি করে। এদের খাদ্য—ছোটো ছোটো মাছ, পোকা-মাকড়, শাক-সব্জি, খাদ্য-শস্যের দানা, মূল, কন্দ প্রভৃতি এসব খেয়ে এরা জীবন ধারণ করে। এরা নির্ভয়ে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। তবে এরা মাঝে মাঝে ফসলের বেশ ক্ষতি করে।

সাধারণত এরা ডিম পাড়ে ২টি করে এবং এদের ডিমের রং ফিকে সবুজ। তাতে বেগুনি রঙের ছিট দেখা যায়।

— লেখকঃ শৈবাল কুমার গুহ, মোঃ-৯০৩৮৮৯৬২২১

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in